ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2137-2144
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.475

বাংলা সাহিত্য ও সমাজে নারীর প্রসাধন প্রসঙ্গ: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

প্রিয়তমা মজুমদার, *স্বাধীন গবেষক, লংকা (হোজাই), অসম, ভারত*

Received: 25.05.2026; Accepted: 27.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Decoration is not only a woman's outer appearance; it is a deep emotion and expectation of a woman's mind. In this decoration i.e., ornaments and clothes, there is both peace of mind and regret in the woman's mind. Just as the ornament is a symbol of success or power or nobility of the woman's society, this ornament again becomes the cause of additional weakness of the female mind. Ornaments or clothes are not only external things; it is the pride of woman's society. Illuminates the outer and inner world and enhances the beauty of woman. Lust for this ornament acts as a symbol of woman's social status and self-confidence in beauty practices.

Key words: women's adornment, the social context of beauty cravings.

বাংলা সাহিত্যে নারীর প্রসাধন যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। নারীর রূপ চর্চা, সৌন্দর্য, আভিজাত্য প্রেম ও সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে নারীর সাজ সজ্জা প্রসাধন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রীতির মধ্যেই পড়ে। কেননা প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের সঙ্গে নারী কিংবা পুরুষের বেশভূষার একটা সম্পর্ক আছে এবং আর গভীর অর্থও আছে। পোশাক– পরিধান নানা জাতির নানা সম্প্রদায়কে তুলে ধরে। বেশভূষায় জাতির পরিচয়। বাঙালি সমাজে সধবা নারীদের সাজ শাঁখা, সিঁদুর রঙিন বস্ত্র পরিধানে পরিপূর্ণ, এবং বিধবাদের তিলক ও সাদা বস্ত্রের সাজ। তাই এই সাজ সজ্জায় উঠে আসে সামাজিক প্রেক্ষাপট ও আভিজাত্যের প্রতিচ্ছবি। এর মধ্যে মিশে আছে নারী মনের আনন্দ, দুঃখ, লোভ, সাংসারিক শান্তি, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব ও পরিপ্রাপ্তি। প্রসাধনের সঙ্গে নারী মনের গভীর সম্পর্ক, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সৌন্দর্যতার বর্ণনাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয় বস্তু।

সৌন্দর্য বলতে আমরা বুঝি প্রকৃতির দান নানা রঙের ফুল, শিশু, পাখি এবং নারী। নারী মানেই সৌন্দর্য আবার সৌন্দর্য মানেই নারী। একজন কবি তার কবিতায় নারীকে তার মনের মতন করে সাজিয়েছেন। (জীবনানন্দ দাশ) কোনো কবি নানা অলংকার দিয়ে (জয়দেব) আবার কোনো কবি প্রাকৃতিক উপকরণের মাধ্যমে নারীকে সজ্জিত করেছেন। বিহারিলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল ও সাধেরআসন কাব্যে নারীকে নানা রূপে, নানা রঙ্গে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে সজ্জিত করেছেন। অন্যদিকে একজন ঔপন্যাসিক কিংবা গল্পকার তার রচনায় নানা প্রসঙ্গে অর্থাৎ কোনো নারীর পরিচয়ের ক্ষেত্রে হোক বা কোনো নারীর স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে হোক সেখানে প্রসাধন প্রসঙ্গ নিয়ে আসে। নারীদের রূপচর্চা, প্রসাধন যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে নানা ভাবে নানা রকমে। আবার কাল ভেদে সেগুলো পরিবর্তন ও হয়েছে।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে আমরা দেখতে পায় নারীর প্রসাধনের সামগ্রী গুলোর মধ্যে ছিল– প্রকৃতির উপাদান। ফুল দিয়ে চুল বাঁধা। চন্দন, তিলক, কর্পূর, সিঁদুর, আলতা, কাজল, পরিধানে পাটের শাড়ি ইত্যাদি। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্যে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে– তাম্বুলখণ্ডে বড়াই কৃষ্ণের কাছে রাধার রূপ বর্ণনার মাধ্যমে দেখা যায় সেই সময়ের নারীর প্রসাধন –

"কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিঁদুর।
সজল জলদে যেহ্ন উহল নব সুর।।
কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে।।
মুনিমনমোহিনী রমণী আনুপামা।
পদুমিনি আক্ষার নাতিনি রাধানামা।।"[১]

প্রাচীন যুগে প্রসাধনের মধ্যে ছিল -কুমকুম, চন্দন, কাজল, ফুল, সিঁদুর, ও পাটের শাড়ি, তিলক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে তার প্রদর্শন পাওয়া যায়। দানখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে মথুরার পথে আটকে দিয়ে বলছে -বার বৎসরের মহাদান তোমার কাছে বাকি পড়িয়াছে এই পঞ্জিকা তার প্রমাণ, তার সঙ্গে রাধার রূপ বর্ণনা দিয়ে বলছে -

"আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট।
আলকে তিলক তোর শোভ এ ললাট।"[২]

প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমে রাধার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে। যাকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ মোহিত হয়।
বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার প্রসাধনে দেখা যায় –

"স্নানে চলিল বেহুলা সাহের কুমারী।
আগে পাছে সখীগণ যায় সারি সারি।।
বাপে সাজাইয়া দিল সাহে বানিয়ার দোলা।
মুখখানি পূর্ণিমার চাঁদ দন্ত গুলি ছোলা।।
.....
চাচর মাথার কেশ চন্দন ললাটে।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন মেঘের নিকটে।।
দশন মুকুতাপাতি অধরে তাম্বুল।
নাসিকার শোভা যেন জিনি তিল ফুল।।
নৃত্যত যুগল যেন নয়নে কাজল।
কমল উপরে যেন ভ্রমর যুগল।।"[৩]

বেহুলার সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে।

"মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিথের সিঁদুর, সেই লাল পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ- শান্ত, স্নিগ্ধ গভীর।"[৪]

বাংলা সাহিত্য ও সমাজে লাল পেড়ে শাড়ি পরিধান করা সধবাদের জীবনে শুভ হিসেবে ধরা হয়। নারীদের বস্ত্র পরিধান কেবল পরিধানই নয় এর মধ্যে জড়িয়ে থাকে নারী মনের গভীর আবেগ, অনুভূতি, স্নেহ, বিশ্বাস, আত্মসম্মানবোধ ও মানসিক শান্তি। উক্ত মন্তব্যটি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিমলা তার মায়ের স্মৃতি চারণের ক্ষেত্রে প্রকাশ করেছে। বিমলার স্মৃতিতে মায়ের প্রসাধনের ছবির সঙ্গে তার মায়ের প্রতি গভীর আত্মঅনুভুতির প্রকাশ ঘটেছে। বিমলা আধুনিক যুগের নারী ও আভিজাত্য পরিবারের বধূ। সে নিজেই বলছে রাজার ঘরে তার

বিয়ে হয়েছে। সুতরাং ধন, ঐশ্বর্য, আভিজাত্য তার স্পর্শে এসেছিল। বিমলার প্রসাধন ও সাজ সজ্জার মধ্যে আধুনিক সমাজের একটা প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠেছে। তার কারণ বিমলার স্বামী নিখিলেশ সেই সময়ের M.A পাশ। নিখিলেশ আধুনিকতাকে পূজা করে। আধুনিক রীতি নীতিকে নিখিলেশ সাদরে তার বাড়িতে প্রবেশ করতে দিয়েছে। তার বাড়ির নারীদেরও সে আধুনিক করার চেষ্টা করেছে। বাড়িতে বিলিতি সাবান, আতর, বস্ত্রের ব্যবহার হত। বিমলাকে লখনউ থেকে জড়ির কাজ করা চটি এনে দেয় ব্যবহার করার জন্য। বিমলার প্রসাধনে পুরাতন সরে গিয়ে আধুনিকতা ফুটে ওঠে।

নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ডাকে বিমলা। সেদিন স্নান সেরে বিমলা চুলে খোঁপা না বেঁধে লাল রেশমের ফিতে দিয়ে জড়িয়ে ছিল এবং–

> "গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজি শাড়ি, আর জড়ির একটুখানি পাড় দেওয়া হাত কাটা জ্যাকেট।"[৫]

বিমলার সাজ সজ্জায় আধুনিকতা বা নতুনত্ব থাকার আর একটি কারণ হল সেই সময়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসিত সমাজ। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে শিক্ষায়,বেশ-ভূষায় ও নানা চিন্তা ভাবনায় পরিবর্তন আসে। বিমলাকে পড়ানোর জন্য একজন ইংরেজ শিক্ষিকা তাদের বাড়িতে আসত। এই শিক্ষিকা মিস গিলবি বিমলাকে আধুনিক রীতিতে একধরণের চুলের খোঁপা বাঁধতে শিখিয়েছিল। বিমলার স্বামী নিখিলেশ সেই খোঁপা খুব ভালোবাসত। সে বলত

> "ঘাড় জিনিসটা যে কত সুন্দর হতে পারে তা বিধাতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ না করে আমার মতো অ-কবির কাছে খুলে দেখালেন! কবি হয়তো বলতেন পদ্মের মৃণাল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন মশাল, তার ঊর্ধে তোমার কালো খোঁপার কালো শিখা উপরের দিকে জ্বলে উঠেছে।"[৬]

নিখিলেশের এমন মন্তব্য বিমলার প্রসাধনকে আর বেশি উজ্জ্বল করে তোলে।

সুন্দর সাজসজ্জা নারীকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করে তোলে। এই সৌন্দর্য পুরুষকে মোহিত করে তোলে। স্বামী ও স্ত্রীর মিলন যে কতটা মধুর তার বর্ণনা বিমলা তার আত্মকথায় দিয়ে বলছে–

> "আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল; সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে, গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো শাড়িটি পরে, ছড়িয়ে- পড়া দেহ-মনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম। সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।"[৭]

স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের ক্ষেত্রে নারীর প্রসাধন একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে কেননা প্রসাধন নারীকে নারী থেকে স্ত্রীতে পরিণত করে। সিঁথিতে সিঁদুরের আভা একজন সধবা নারী গৌরব ও অহংকারবোধ অনুভব করে। মধ্যযুগীয় সমাজে কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তার চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনা ও ধনপতির মিলন যাত্রায় খুল্লনার সাজের অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সময়ের নারীরা প্রসাধনে কি কি সামগ্রী ব্যবহার করত তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে খুল্লনার সাজের মধ্য দিয়ে। কবির ভাষায় –

"দুর্বলা বুঝিয়া কাজ আনিল বেশের সাজ
মৃগমদ কুমকুম চন্দন।
ভাণ্ডারে প্রবেশি চেড়ী আনে আভরণ- পেড়ি
লহনার উচাটন মন।

পীত তড়িত বর্ণে হেম কন্তলিকা কর্ণে
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলি।
রজত পাশুলি ছটি পরে দিব্য তুলাকোটি
বাহু বিভূষণ ঝলমলি।।
পরে দিব্য পাটশাড়ি কনকের পরে চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মতি পলা কলধৌত-কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক।
নানা আভরণ পরি ডানি করে নিল ঝরি
বাম করে তাম্বূল-সাঁপুড়া।
সুনাদ নূপুর পায় কুঞ্জর গমনে যায়
লহনা শুনিতে পায় সাড়া।।"[৮]

প্রসাধন ও নারীর ঈর্ষা:

ঈর্ষা নারী চরিত্রের আর একটি অংশ। ঈর্ষা প্রবৃত্তি ছাড়া একটি নারীও যেন সম্পূর্ণ হয় না। ঈর্ষা নারী চরিত্রের স্থায়ী বিষয়। খুল্লনার সুন্দর সাজে লহনার ঈর্ষা হয়। লেখকের ভাষায়—

"সুনাদ নূপুর পায় কুঞ্জর গমনে যায়
লহনা শুনিতে পায় সাড়া
হৃদে বিষ মুখে মধু হাসিয়া লহনা বধূ
কহে হিত উপায় বচন।"[৯]

আধুনিক যুগে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসেও দেখা যায় বিমলার সুন্দর সধবার পরিপাটি প্রসাধনকে ঈর্ষা করত তার বড় দুই বিধবা জায়েরা। এক নারীর সুখ সৌন্দর্য অন্য নারীর সহ্য হয় না। বিমলার স্বামী তাকে হাল ফেশানের সাজে সাজিয়েছে। সেই সমস্ত রঙ্গ বেরঙ্গের জ্যাকেট শাড়ি শেমিজ পেটিকোটের আয়োজন দেখে তারা জ্বলতে থাকত। "রূপ নেই, রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো, লজ্জা করে না!"[১০] এই ধরণের ঈর্ষান্বিত মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হত বিমলাকে। তবে এই ঈর্ষাকে নিয়ে বিমলা একটা মন্তব্য করেছেন যে–

> "অন্যায় বলব কেমন করে? ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে যে, যা- কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।"[১১]

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় দেখা যায় গ্রামের যাত্রা দেখার জন্য পরান ও মতি তৈরি হয়। ডুরে শাড়ি পড়ে মতি হয়েছে সুন্দরী। কিন্তু কম বয়সী মতির হালকা অপরিণত দেহকে পরানের বউ কুসুম হিংসা করে। "মনে হয় তাহার নিজের স্বাস্থ্য এতখানি ভালো না হইলেই যেন সে খুশি হইত।"[১২]

অলংকারের প্রতি নারীর লোভ:

নারীর প্রসাধনের সামগ্রীর মধ্যে একটি বিশেষ জিনিস হল অলংকার অর্থাৎ সোনা। আমাদের সমাজে সোনা বড় ধনের সামগ্রী। যার মূল্য বহু মুদ্রার। এই ধন নারীকে যতটা শক্তিশালী ও ভিতর থেকে সাহসী করে তোলে ঠিক তেমনি এই ধন নারীদের দুর্বলতার কারণ হয়ে ওঠে। আমরা দেখতে পাই চণ্ডীমঙ্গলে পাঁচ পল সোনার

বিনিময়ে লহনা স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য অনুমতি দিয়ে দেয়। নিজের স্বামীকে অন্য নারীর হাতে অর্পণ করে দিতে রাজী হয়ে যায়। যেমন-

"রত্ন পেয়ে যত্নে নিল লহনা যুবতী
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি।"[১৩]

সামান্য প্রসাধনের জিনিস নারীর মনকে কতটা বদলে দিতে পারে তা এখানে নিঃসন্দেহে ধরা পড়ে। নারীদের যে অলংকারে লোভ আসক্তি থাকে কিংবা এই সব সামগ্রী যে নারীদের দুর্বল করে দেয় একথা পুরুষ শাসিত সমাজ সকলেই জানে। বাংলা সাহিত্য সমাজে অনেক পুরুষদের দেখা যায় যে নারীকে অলংকার, বসন ভূষণ দিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়। কিংবা নারীকে ভোগ করতে চায়। ধনের বিনিময়ে নারী নিজেকেও বিক্রি করে দেয় কাল বিশেষে। মধ্য যুগে দেখা যায় ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য প্রথম স্ত্রীকে ধন দিয়ে তাকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের ইচ্ছা বা চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করছে। যেমন-

"পরিতোষে লহনারে দিয়া পাটশাড়ি
পাঁচপল সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি।
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মম মনে।
যেমন আছিলা পূর্বে বিবাহের দিনে।"[১৪]

শাড়ি গয়না দিয়ে লহনাকে স্বামী সান্তনা দিচ্ছে। ধনের কাছে নারী আত্মসমর্পণ করে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'য় দেখা যায় ডিঙ্গিতে একজন সাধু মহুয়াকে নানা আভূষণ, অলংকারের লোভ দেখিয়ে তাকে কাছে পেতে চাইছে। যেমন:-

"বসন ভূষণ দিব আমি দিব নীলাম্বরী।
নাকে কানে দিব কুল কাঞ্চা সোনার গড়ি।।
গন্ধতৈল দিয়া তোমার বাইন্ধ্যা দিবাম কেশ।
.....
লক্ষ টাকার হার তোমায় দিবাম গড়াইয়া
সোনাতে বান্ধাইয়া দিবাম কামরাঙ্গা শাঁখা।
উদয় তারা সারি দিবাম লক্ষ টাকার মূল।
হিরামনি দিয়া তোমার জুইরা দিবাম চুল।।
চন্দ্রহার গড়াইয়া দিবাম নাকে দিবাম নথ।
নূপুরে ঝুনঝুনি কন্যা দিবাম শতশত।"[১৫]

প্রসাধনের মধ্যে মেয়েদের চুলে ফুল দিয়ে খোঁপা বাঁধার প্রথা বহুকাল থেকে চলে এসেছে। এটি নারীর সৌন্দর্যবৃদ্ধির আর একটি পদ্ধতি। ফুল ও নারী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একে অপরকে ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। ময়মনসিংহ গীতিকায় মহুয়া নদের চাঁদকে বলছে-

"ফুল যদি হইতারে বন্ধু ফুল হইতে তুমি।
কেশেতে ছাপাই রাখতাম ঝাইড়িয়া বানতাম বৈনী।"[১৬]

এই ফুল প্রেমের প্রতীক। ফুল দিয়ে খোঁপা বাঁধার প্রসঙ্গ বাংলা নানা গল্প ,উপন্যাসে রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দির 'গিরগিটি' গল্পে ভুবন সরকার মায়াকে বলছে– "আমার ইচ্ছা লাল দোপাটি করার। লাল ফুল দিদির বেণীতে মানাবে ভাল।"[১৭] এই গল্পে দেখা যায় মায়া প্রসাধনে খুব আগ্রহী প্রকৃতির। সেজে গুজে পরিপাটি হয়ে থাকতে

মায়া খুব পছন্দ করে। মায়ার স্বামী প্রণব অফিস থেকে ফেরার সময় ফজলি আম ও এক ডিবি পাউডার কিনে আনে। সেদিন মায়া বিকেলে সাজে। লেখকের ভাষায়–

> "সুন্দর খোঁপায় এত বড় একটা নীল অপরাজিতা গোঁজা। সিঁদুরের ফুটাটা টকটক করছে সিঁথি মুলে। অপরাজিতা রঙের ব্লাউজ। ব্লাউজের সঙ্গে মিলিয়ে হাল্কা কমলা রং এর শাড়ি। ঠোঁটে রং আছে কিনা প্রণব বুঝতে পারল না। তোয়ালের কোণায় আলতা লাগিয়ে ঠোঁট ঘষা হতে পারে। প্রণব অনুমান করল। তার ঘরে লিপস্টিক নেই।"[১৮]

সংসারের অভাব বা দরিদ্রতাও নারীদের প্রসাধনে বাধা দিতে পারে না। মায়া সেজে গুজে আয়নার সামনে দাড়ায় ও নিজেকে দেখে তাতে সে পরিতৃপ্তি পায়।

বাংলা ছোট গল্পে দেখা যায় প্রসাধন কেবল রূপচর্চা নয়, সেখানে সামাজিক অবস্থান ও নারী চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। রবীন্দ্র ছোট গল্পে নারীদের সাজসজ্জা খুব সীমিত। সেখানে নারীদের প্রসাধনের চেয়েও গ্রামীণ রূপই বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। 'হৈমন্তী' গল্পে দেখা যায় হৈমন্তীর ফটোগ্রাপে একটা সাদা সিধা শাড়ি পড়ে আছে। দুটি খালি পা। আর অন্য কোনো সাজ নেই। কিন্তু তবুও তাকে অপূর্ব সুন্দর লেগেছিল অপুর কাছে। অন্য দিকে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালকে দেখা যায় বিদ্রোহী নারীর সাজ। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে প্রসাধনকে ত্যাগ দেয়। স্বামী তার হাত খরচের টাকা বন্ধ করে দিলে মৃণাল পাঁচ সিকে দামের মোটা ধুতি পরতে শুরু করে দেয়। তার এই ত্যাগ মৃণাল চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। নিজেকে নতুন ভাবে গড়ে তুলেছে। তার প্রসাধন বর্জন প্রতিবাদের প্রতীক। 'ল্যাবরেটরি' গল্পে দেখা যায় সোহিনী চরিত্র অনেকটা ব্যাতিক্রমি। সে তার প্রসাধন ও ব্যাক্তিত্বের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চায়। সাজ সজ্জার মাধ্যমে সোহিনীর মানসিক দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। রেবতিকে মুগ্ধ করার জন্য সোহিনী তার মেয়ে নীলাকে সুন্দর সাজ সজ্জার মাধ্যমে পরিবেশন করেছে। নীলার সাজে রয়েছে-

> "নীলচে সবুজ বেনারসি শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাচুলি। কপালে তার কুমকুমের ফোঁটা, সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার'পরে মখমলের কাজ করা স্যান্ডেল।"[১৯]

অন্য দিকে সোহিনী নিজেকেও সুন্দর বিধবার সাজে সাজিয়ে তুলেছে। সাদা শাড়ি পরে মাথায় কাঁচাপাকা চুলে পাউডার মেখে সোহিনী মুখের উপর একটি শুচি সাত্ত্বিক আভা মেজে তুলেছে। রেবতির সম্মুখে নীলার আগমন ঘটে এইভাবে, লেখকের ভাষা–

> "নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদ্দুর পড়ছে তার কপালে তার চুলে, বেনারসী শাড়ির উপরে জড়ির রশ্মি ঝলমল করে উঠেছে। রেবতীর দৃষ্টি এক মুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে।"[২০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মান ভঞ্জন' গল্পে দেখা যায় গোপীনাথের অবহেলিত স্ত্রী গিরিবালার করুণ দশা। গল্পে স্বামীর প্রেম থেকে বঞ্চিত গিরিবালার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার বা সাজ সজ্জা। সুন্দর যৌবনে ভরপুর গিরিবালার দিকে দৃষ্টিপাত করার মতো কোনো আগ্রহ বা সময় গোপীনাথ দেয় না। গিরিবালা একা একা রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করে বাড়ির ছাদের ওপরে চঞ্চল হয়ে বেড়াতে থাকে। সে তার অবসর সময়গুলোকে প্রসাধন করে কাটাত। লেখকের ভাষায়-

> "গিরিবালা ও আপন লাবণ্যোচ্ছাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে। তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে,

> নূপুরনিক্কনে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খলভাবে উদবেলিত হইয়া উঠিতেছে।"[২১]

গিরিবালা সাজ সজ্জাকেই নিজের নিত্য সঙ্গী হিসেবে মেনে নিয়েছে। স্বামী তাকে দেখতে না এলেও সে নানা অলংকাল গয়না দিয়ে নিজেকে সুসজ্জিত করে রাখে। চৈত্র মাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বাসন্তী রঙের কাপড় পড়ে আঁচল উড়িয়ে ছাদে বসে। সেদিন, লেখকের ভাষায়-

> "হীরা মুকুতার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রতঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার ক্রিত-ঝল মল করিয়া, রুনুঝুনু বাজিয়া তাহার চারিদিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুনি ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে।"[২২]

আলোচনার অন্তিমে আমরা বলতে পারি যে প্রসাধন নারীর যেমন সুখের সঙ্গী আবার তেমনি দুঃখেরও সঙ্গী হয়ে উঠে। প্রসাধন নারীদের প্রতিদিনের অবলম্বন হয়ে দাড়ায়। এই প্রসাধনের মাধ্যমে একজন স্ত্রীর আত্মপরিচয় ফুটে উঠে। তবে আমরা দেখতে পাই যে অনেক ক্ষেত্রে এই সাজ সজ্জা বা অলংকার নারী মনের যথেষ্ট সুখের জিনিস হয়ে উঠতে পারে না, কেবল প্রসাধনই নারীকে সম্পূর্ণ সুখী করতে পারে না। কেননা প্রসাধন নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় এবং সেই সৌন্দর্য যখন প্রিয়জনের কাছে অবহেলিত বা বঞ্চিত হয় তাহলে সেখানে নারীর ব্যার্থতাই ধরা পড়ে। তখন সমস্ত শরীর অলংকারে ঝল মল করলেও জীবনের আলো হারিয়ে যায়।

তথ্যসুত্র:

১) ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদিত ভূমিকা)। বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। প্রথম প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬। প্রকাশক: সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ পৃ: ২০৭।

২) তদেব, পৃ: ২২৬।

৩) বিশ্বাস, অচিন্ত্য (ভূমিকা ও সম্পাদনা)। কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল। প্রকাশকাল: শ্রাবণ, ১৪২৪ (আগস্ট ২০১৭) পৃ: ২৭০।

৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ঘরে বাইরে। প্রকাস্ক: প্রসেনজিৎ দাঁ, সুন্দর প্রকাশনী ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩ পৃ: ৫।

৫) তদেব, পৃ: ১৯।

৬) তদেব, পৃ:৭১।

৭) তদেব, পৃ: ৭।

৮) আচার্য, ড: দেবেশকুমার (সম্পাদনায়)। কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল। প্রথম প্রকাশ: ১৫ই আগস্ট, ২০০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ: মার্চ ২০০৭ পৃ: ৪৬।

৯) তদেব, পৃ: ৪৬।

১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ঘরে বাইরে। প্রকাস্ক: প্রসেনজিৎ দাঁ, সুন্দর প্রকাশনী ৪, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩ পৃ: ৯।

১১) তদেব, পৃ:১০।

১২) বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। পুতুলনাচের ইতিকথা। প্রকাশক: শ্রী তপনকুমার বিশ্বাস, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা– ২০১৭ পৃ: ৪৭।

১৩) আচার্য, ড: দেবেশকুমার (সম্পাদনায়)। কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল। প্রথম প্রকাশ: ১৫ই আগস্ট, ২০০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ: মার্চ ২০০৭, পৃ: ৯,

১৪) তদেব, পৃ: ৯।

১৫) সেন, দীনেশ চন্দ্র (ভূমিকা)। মৈমনসিংহ– গীতিকা। প্রকাশক: বিকাশ সাধুখাঁ, নব সংস্করণ: ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ: ২০০৮ পৃ: ৫১।

১৬) তদেব,পৃ: ৩৯।

১৭) বসু, ড: নিতাই (সম্পাদনা ও ভূমিকা)। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প। দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৬০, পৃ: ১১৮।

১৮) তদেব, পৃ: ১১২।

১৯) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পসমগ্র। সম্পাদনা: প্রশান্তকুমার পাল, প্রকাশক: নিমাই গরাই, লালমাটি, প্রকাশন: ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, বিমেলা-২০১৪ পৃ: ৯০২।

২০) তদেব, পৃ: ৯০৩।

২১) তদেব, পৃ: ৩০২।

২২) তদেব, পৃ: ৩০৫।